Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাইমুনা আক্তার

রোলঃ 216020260

২৬ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাইমুনা আক্তার

রোলঃ 216020260

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাইমুনা আক্তার, আইডিঃ 216020260 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাইমুনা আক্তার
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মাইমুনা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৬ মে, ২০২৪ ইং

মাইমুনা আক্তার

আইডিঃ 216020260

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা 9

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলতঃ 11

মসজিদ নির্মাণ করলে যে সওয়াব পাবেনঃ 16

মসজিদ : ব্যবস্থাপনা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 18

ইসলামে মসজিদ পরিচালনার মূলনীতি 21

চাই দ্বীনদার মসজিদ কমিটি 27

ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ চার মসজিদ 28

অমুসলিম দেশে মুসলিম স্থাপনা ও এর গুরুত্ব 34

মুসলমান দেশ ছাড়াও বিশ্বের অমুসলিম অনেক দেশেই ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে। 34

লা গ্র্যান্ড মসজিদ প্যারিস, ফ্রান্স 34

জামে মসজিদ 36

কর্ডোভা মসজিদ 37

কলোগনি সেন্ট্রাল মসজিদ 40

মানবিক ও সুস্থ ধারার সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা : 41

মানবিক ও সুস্থ্ ধারার সমাজ গঠনে মসজিদের ভুমিকা 42

ভূমিকা

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে মসজিদ

আরবি مسجد শব্দটি سجد শব্দমূল থেকে উদ্গত। ইসমুল মাকান বা স্থানবাচক শব্দ হিসেবে مسجد শব্দটির অর্থ হয় ‘অবনত হওয়ার স্থান’। এ নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা যারকাশি (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু মসজিদে সালাত আদায় করা হয়। আর সালাতের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো সিজদা, যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ কারণেই মসজিদকে মসজিদ বলা হয়। [যারকাশি, *ই’লামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ* : পৃ. ২৮]

পারিভাষিক অর্থে মসজিদ বলা হয়, المكان الذي أُعِدّ للصلاة فيه على الدّوام ‘সালাতের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট স্থান।’ [মুহাম্মাদ কালয়াজি, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৩৯৭] আর ব্যাপকার্থে উম্মতে মুহাম্মদির জন্য পৃথিবীর সমস্ত পবিত্র স্থানই মসজিদ। আল্লামা কাযি ইয়াযের মতে, এটা এ উম্মতের বিশেষ মর্যাদা। আল্লামা যারকাশি বলেছেন যে, ‘আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত সালাত আদায় করতে পারতো না। কিন্তু আমাদের জন্য পবিত্র সমস্ত জায়গায়ই সালাত আদায় বৈধ করা হয়েছে।’ [যারকাশি, *ই’লামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ* : পৃ. ২৭]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

'আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোনো নবিকেই দেওয়া হয়নি। ১. আমাকে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা এক মাসের ব্যবধান থেকেও অনুভূত হয়। ২. *আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যেখানে যার সালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানে সে সালাত আদায় করে নিবে।* ৩. আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ৪. প্রত্যেক নবিকে বিশেষভাবে তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠানো হতো। আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতির প্রতি। ৫. আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করা হয়েছে।' [বুখারি, *আসসাহিহ* : ৩৫৩; মুসলিম, *আসসাহিহ* : ৫২১]

আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ

'যেখানেই সালাতের সময় হবে সেখানেই সালাত আদায় করে নেবে। সেটাই মসজিদ।' [বুখারি, *আসসাহিহ* : ৪২৫; মুসলিম, *আসসাহিহ* : ৫২০]

ইমাম নববি (রহ.) বলেন, 'এই হাদিস শরিয়ত নিষিদ্ধ জায়গা (কবরস্থান, অপবিত্র স্থান, টয়লেট-গোসলখানা ইত্যাদি) ব্যতীত বাকি সমস্ত জায়গায় সালাত বৈধ হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।' [নববি, *শারহু সাহিহ মুসলিম* : ৫/৫]

যদিও গোটা জমিনটাই মসজিদ, এরপরও বিশ্বের যেখানেই মুসলমানরা বাস করছে সেখানেই গড়ে উঠেছে মসজিদ। আল্লাহর ইবাদাত, সমাজের পরস্পরে মেলবন্ধনসহ নানাবিধ হিকমতে জমিনের প্রান্তে প্রান্তে গড়ে উঠেছে মসজিদ। এক পরিসংখ্যান মতে, সারা বিশ্বে প্রায় ২৫ লাখেরও বেশি মসজিদ রয়েছে। বাংলাদেশে রয়েছে ২.৫ লাখেরও বেশি মসজিদ। আর শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই রয়েছে ৬ হাজার মসজিদ। আয়তনের সঙ্গে সংখ্যার তুলনা করলে বাংলাদেশেই মসজিদের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

মসজিদের অত্যধিক ফজিলতের কারণেই আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে ২৮ জায়গায় এর আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মসজিদকে তার নিজের দিকে সম্মানমূলক সম্মন্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا

'নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।' [সুরা জিন, ৭২ : ১৮]

আল্লাহ তায়ালা মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বহু ফজিলতের ঘোষণা দিয়েছেন। এমনকি এটাকে ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

'নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি এবং যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত আদায় করে; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [সুরা তাওবা, ৯ : ১৮]

বরং মসজিদে যেতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ইমানদার হিসেবে সাক্ষ্য দিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ...

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমরা কোনো মানুষকে দেখবে সে মসজিদের সাথে সম্পর্ক গড়ছে, তখন তোমরা তার ইমানের স্বীকৃতি দাও।' এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : 'নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি এবং যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে...।' [সুরা তাওবা, ৯ : ১৮]

ইমাম কুরতুবি (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদেরকে মুমিন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে মসজিদকে প্রাণবন্ত রাখবে, মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখবে, মসজিদের সংস্কার কাজ করবে এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।'

মসজিদের সুরক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালা জিহাদকে বিধিবদ্ধ করেছেন। জিহাদ না থাকলে ইবাদাত ও মুয়ালাতের এ কেন্দ্রগুলোও টিকে থাকবে না। এটাও মসজিদের ফজিলতের প্রমাণ বহন করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

'আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে উপাসনালয়, গির্জা, প্যাগোডা ও মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।' [সুরা হজ, ২২ : ৪০]

ইমাম কুরতুবি (রহ.) এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'আল্লাহ যদি নবিদের ওপর এবং মুমিনদের ওপর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ফরজ না করতেন তাহলে মুশরিকদের স্পর্ধা বেড়ে যেত এবং ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে তারা বিঘ্নতা সৃষ্টি করতো। আর এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতিহত করা আবশ্যক করেছেন, যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে মানুষ আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে।'

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

'আল্লাহ যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এমন লোকেরা, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।' [সুরা নুর, ২৪ : ৩৭]

উসমান ইবনু আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর নির্মাণ করবেন।'

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

‘মুমিনদের যেসমস্ত আমলের ধারা মৃত্যুর পরও চলমান থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো, ১. সেই ইলম (জ্ঞান) যা সে প্রসার করে গেছে। ২. রেখে যাওয়া নেক সন্তান। ৩. রেখে যাওয়া কুরআনের কপি। ৪. তার নির্মাণকৃত মসজিদ। ৫. তার নির্মাণ করে যাওয়া মুসাফিরখানা। ৬. তার স্থাপন করে যাওয়া নলকূপ। এবং ৭. ওই সাদাকা, যা বেঁচে থাকতে সে দান করে গেছে।’

যদি কেউ একা একটি মসজিদ নির্মাণ করে, তার জন্য এই প্রতিদান। কিন্তু এটা তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি মসজিদ নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করে, তাহলে কেমন প্রতিদান রয়েছে আসুন এবার তা-ই দেখি—আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে পাখির বাসা পরিমাণ কিংবা তারচেয়েও ছোট মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।’

আলিমগণ বলেছেন, ‘যারাই মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করবে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অংশগ্রহণের পরিমাণ অনুযায়ী প্রতিদান পাবে।’

মসজিদ নির্মাণের অত্যধিক ফজিলতের কারণ ফুটে ওঠেছে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.)’র এই কথা থেকে। তিনি বলেন, ‘মসজিদ হলো উম্মাহর ইবাদাতগাহ ও মিলনকেন্দ্র। নবি (সা.) প্রতিষ্ঠিত মসজিদের কর্মসূচি ছিল সালাত,

কিরায়াত, জিকির, নেতৃত্ব ও সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা। মুসলিমরা তাতে একত্রিত হতো তাদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক যেকোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।'

মসজিদ হলো ইমানের ইস্পাতকঠিন দূর্গ। তাওহিদের বাণী প্রচারের কেন্দ্র। মসজিদ হলো সেই বিদ্যালয়, যেখান থেকে গড়ে উঠেছিলেন এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম। মসজিদই ছিল সেকালে জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ কেন্দ্র। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) হিজরতের পর মদিনায় এসে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। পথিমধ্যে কুবায় অবস্থানকালে সেখানেও মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এমনিভাবে মুসলিমরা পরবর্তীতে যে অঞ্চলই বিজয় করেছে, সেখানেই তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুসলিম-ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে আজও জ্বলজ্বল করছে সেসসব মসজিদ।

মসজিদ নির্মাণ করলে যে সওয়াব পাবেনঃ

মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূলকেন্দ্র। এ কারণে রাসুল (সা.) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজরতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে মদিনায় পৌঁছে তিনি মসজিদ-ই-নববী স্থাপন করেন। এবং সেখান থেকেই ইসলামের জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।’ (বুখারি, হাদিস : ৪৫০)

বিজ্ঞাপন

তাছাড়া মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পুণ্যময় কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। যত দিন সেই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হবে, তত দিন নির্মাণকারী এর সওয়াব পেতে থাকে। ইরশাদ হয়েছে, ‘সাত ধরনের আমলের প্রতিদান মৃত্যুর পর কবরেও জারি থাকে। ১. যে ব্যক্তি কাউকে দ্বিনি ইলম শিক্ষা দেবে। ২. যে নদী প্রবাহিত করতে সহযোগিতা করবে। ৩. অথবা কূপ খনন করবে। ৪. অথবা গাছ রোপণ করবে। ৫. অথবা মসজিদ নির্মাণ করবে। ৬. অথবা কোরআন বিতরণ করবে। ৭. অথবা সুসন্তান রেখে যাবে যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করবে। (আল বাহরুজ জাখখার : ১৩/৪৮৪)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষ অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত। লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৯)

তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখবে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫)

মসজিদ : ব্যবস্থাপনা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মসজিদের সঙ্গে কমবেশি সবাই পরিচিত। মসজিদ আল্লাহর ঘর।এটা হলো প্রতিটি মুমিনের জন্য একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। মুমিনের জীবনের সবক্ষেত্রে এর গভীর প্রভাব রয়েছে।মসজিদ শুধু ইবাদত-বন্দেগির জন্য নয়, এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ।

ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়াদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার স্থান হচ্ছে মসজিদ।

পবিত্র কোরআনে কারিমেও মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, 'আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমন্ডল সোজা রাখ এবং তাকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে। ' -সূরা আল আরাফ : ২৯

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তার নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সে দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। ' -সূরা নুর : ৩৬-৩৭

বর্ণিত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘরসমূহের অর্থ মসজিদ। বলা চলে, দেশের প্রতিটি মহল্লা ও শহরের বিভিন্ন এলাকার মসজিদ নির্মাণের একমাত্র মূল কারণ এই আয়াতের শিক্ষা।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হচ্ছে মসজিদ আর সবচেয়ে অপছন্দীয় স্থান হলো বাজার। -মুসলিম

হজরত ওসমান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ বানাবে, আল্লাহপাক তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করে রাখবেন। -বোখারি ও মুসলিম

মানুষ হিসেবে আমরা যেমন সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি। তেমনি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক মহল্লা বা সমাজের মসজিদগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার। এটা মুসলমানদের দায়িত্বও বটে। গুরুত্ব সহকারে আমাদের এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইবাদত-বন্দেগির পূর্ব শর্ত হচ্ছে পাক-পবিত্র হওয়া। দেখা যায় অনেক মসজিদে এ সবের পর্যাপ্ত কোনো ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া মসজিদ থাকে অপরিচ্ছন্ন। এসব সমস্যা দূর করতে সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

সাধারণ রীতি অনুযায়ী দশের টাকায় মসজিদ নির্মাণ করতে হয়। তবে টাকা সংগ্রহ করতে যেয়ে এমন কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়- যা রীতিমতো অপমানজনক। অভিজ্ঞ আলেমরা এসব এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। আমাদেরও সে দিকে খেয়াল রাখা দরকার। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নানা ধরনের অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় মসজিদ পরিচালনার ক্ষেত্রে। এরও সমাধান কাম্য।

ইসলামে মসজিদ পরিচালনার মূলনীতি

মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় জীবনে মসজিদের প্রভাব অপরিসীম। মুসলিম সমাজের জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় অনুশীলন থেকে শুরু করে সামাজিক ঐক্য ও সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের অনেকটাই মসজিদের ওপর নির্ভরশীল।

মসজিদ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের উৎসভূমি। এটি মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

মুসলমানরা দিনে পাঁচবার মসজিদে যায়। সেখানে সালাত আদায় করে। তারা মসজিদে আল্লাহর কাছে দয়া, ক্ষমা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে। মসজিদ যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাতিঘর, তেমনি ইবাদত-বন্দেগির মিহরাব।

তাই মসজিদ নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ এবং সর্বোপরি যেকোনো চাহিদা পূর্ণ করে আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধান করা প্রত্যেক মুসলিম সমাজের নৈতিক দায়িত্ব।

এ ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হলো, যথাসম্ভব মসজিদ আবাদ রাখতে হবে। আল্লাহর ইবাদত ও দ্বিনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা প্রাণবন্ত করে রাখতে হবে। ইসলামের সোনালি যুগে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে শুরু করে সামাজিক বিচার ও যুদ্ধের পরামর্শ পর্যন্ত সব কাজ মসজিদে অনুষ্ঠিত হতো।

মসজিদে নববী ছিল মহানবী (সা.)-এর সচিবালয়ের মতো। এ জন্য কোরআনে মসজিদের ব্যাপারে ‘আবাদ’ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই মসজিদ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।’ (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ইবাদত ও দ্বিনি কাজই শুধু সেখানে অনুমোদিত।

ইসলামী শরিয়তবিরোধী এবং ইবাদতের পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ মসজিদে করা যাবে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই মসজিদগুলো আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে ডেকো না।’ (সুরা : জিন, আয়াত : ১৮)

মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখাও মুসলিম সমাজের দায়িত্ব। মসজিদে ময়লা আবর্জনা ফেলবে না এবং কোনো ময়লা চোখে পড়লে তা নিজ থেকে পরিষ্কার করা উচত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘মসজিদে থুথু ফেলা পাপ। এ পাপের মার্জনা হলো তা পরিষ্কার করা।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ১৬৩৭)

ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের ব্যাপারে ছয় শ্রেণির মানুষ দায়িত্বশীল। তাঁরা হলেন ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, মক্তব-পরিচালক, কমিটি ও দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা। প্রত্যেকের ওপর নির্ধারিত কিছু দায়িত্বও রয়েছে। যেমন—ইমাম যথাযথভাবে

নামাজ করবেন এবং মুসল্লিদের দ্বিনি জ্ঞান, ঈমান ও আমলের উন্নয়নের চিন্তা করবেন। মুয়াজ্জিন যথাসময়ে আজান দেবেন। ইমামকে সহযোগিতা করবেন। খাদিমরা নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করবেন। মক্তব-পরিচালক মুসলিম শিশুদের ফরজ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবেন। কমিটি ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মসজিদ ও মুসল্লিদের প্রয়োজনগুলো পূরণের চেষ্টা করবেন। মসজিদের সার্বিক পরিচালনার ক্ষেত্রে ইমামকে পরামর্শ দেবেন এবং তাঁর থেকে পরামর্শ নেবেন। (আহকামুল মাসাজিদ ফিশ-শারিয়াতিল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা : ৪০৫-৮)

মসজিদ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা মুসলমানদের ঈমানি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মসজিদ পরিচালনাকারী মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআনের এক আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সেই সব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।’ (সুরা নুর, আয়াত : ৩৬-৩৭)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, এমন মানুষের তত্ত্বাবধানে মসজিদ পরিচালিত হওয়া জরুরি, যাদের সঙ্গে মসজিদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রচিত হয়েছে, যারা সুখে-দুঃখে সব সময় মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। ইবাদত ও আমলের মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ রাখে।

মসজিদকে সমুন্নত রাখা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। মসজিদকে সমুন্নত রাখার অর্থ হলো, যে উদ্দেশ্যে মসজিদের নির্মাণ সে উদ্দেশ্য যথার্থভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। মসজিদ নির্মাণ করা, সংস্কার করা, সম্প্রসারণ করা, ইবাদত-বন্দেগির পরিবেশ সৃষ্টি করা। যোগ্য ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেম নিয়োগ দেওয়া, তাঁদের সম্মানজনক সম্মানীর ব্যবস্থা করা, মসজিদকেন্দ্রিক দ্বিনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এক কথায় সুচারুরূপে মসজিদ পরিচালনা করার সব বিষয়ই মসজিদ সমুন্নত করার অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমান মাত্রই মসজিদের নির্মাণ, পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের যেকোনো পর্বে অংশ নিতে পারাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। তাই বলে সামাজিকভাবে মুসলমান দাবি করলেই কেউ মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁকে ন্যূনতম কিছু বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। ওপরে উল্লিখিত আয়াতে সেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মসজিদ আবাদ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত

তাফসির বিশারদ আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, ‘মসজিদ আবাদের অর্থ কেবল তার চাকচিক্য ও বাহ্যিক সৌন্দর্যবর্ধনই নয়, বরং মসজিদ আবাদ করার অর্থ তাতে আল্লাহর আলোচনা করা, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা এবং মসজিদকে সব ধরনের শিরক ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখা।’ (ইবনে কাসির : ১/২৭০)

আল্লাহর ঘর মসজিদের দেখাশোনা করা, পবিত্রতা রক্ষা করা, পরিচালনা করা এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা সাওয়াবের কাজ। অন্যদিকে মসজিদ পরিচালনা করতে গিয়ে যদি কেউ অনৈসলামিক কাজ করে তার পরিণামও খুব খারাপ। তাই মসজিদ কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে জানা কমিটির সদস্যদের জন্য ফরজ, যেন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আল্লাহর ঘর নিয়েই তারা পাপে জড়িয়ে না যায়। সুতরাং অমুসলিমরা যেমন মসজিদ পরিচালনায় যুক্ত হতে পারে না, তেমনি ইসলামের শর্তভঙ্গকারী কোনো মুসলিমও মসজিদ কমিটির সদস্য হতে পারে না। কারো সামাজিক ক্ষমতা বা আর্থিক প্রতিপত্তি থাকলেই তাকে মসজিদ পরিচালনার যোগ্য ভাবা সংগত নয়। মসজিদের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক পেশা বা স্বভাবের কেউ মসজিদ কমিটির যোগ্য হতে পারে না।

মসজিদে বহু মত, শ্রেণি ও পেশার মানুষ আসে। সবার শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ও কার্যকলাপ যথার্থ নাও হতে পারে। কিন্তু মসজিদের সমস্যা সমাধান করতে হবে

হেকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে। কারো সঙ্গে এমন আচরণ করা যাবে না যে সে মসজিদবিমুখ হয়ে পড়ে। মসজিদ পরিচালনাকারীদের নিম্নোক্ত হাদিস জানা থাকা জরুরি। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের বলেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি অথবা এক পাত্র পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদের নম্র ব্যবহারকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি। (বুখারি, হাদিস : ৬১২৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, লোকটি প্রস্রাব শেষ করলে মহানবী (সা.) লোকটিকে ডেকে বলেন, 'দেখো, এসব মসজিদ প্রস্রাবের জন্য বানানো হয়নি। এটাকে বানানো হয়েছে ইবাদত-বন্দেগি, তাসবিহ-তাহলিল করার জন্য।' অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এক বালতি পানি ঢালতে বলেন।

দেখুন, মহানবী (সা.) মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণে কিভাবে হেকমত অবলম্বন করেছেন। এটাই মসজিদ পরিচালনার সর্বশ্রেষ্ঠ মূলনীতি। মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

চাই দ্বীনদার মসজিদ কমিটি

মসজিদে নববী ছিল ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার স্থল, মামলা মোকদ্দমার মীমাংসা ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দু। শুধু ধর্মীয় উপাসনালয় নয়; বরং প্রতিটি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মসজিদ।

আমাদের দেশে মসজিদগুলো পরিচালনার জন্য প্রতিটি মসজিদেরই একটি সুনির্দিষ্ট কমিটি রয়েছে। একজন অমুসলিম যেমন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য হতে পারে না তেমনি বড় ধরনের ইসলামবিচ্যুত কাজে জড়িত এমন কোনো ব্যক্তিও মসজিদ কমিটির সদস্য হতে পারেন না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ইমান রাখে, সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (সূরা তাওবাহ, আয়াত-১৮)।

আয়াতে আবাদ শব্দ দ্বারা মসজিদ পরিচালনার বিষয়টিও বোঝানো হয়েছে। কে বা কারা মসজিদ পরিচালনা করবে তা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে (ইবনে কাসির : ১/২৭০)। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ মসজিদের কমিটির অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

দেশের অধিকাংশ মসজিদের কমিটিগুলো দখল করে আছেন বেনামাজি, সমাজের অসৎ চাঁদাবাজ, কালোবাজারি, দুর্নীতিবাজ, সুদখোর, ঘুষখোর মানুষরা। লজ্জার বিষয় হলেও সত্য যে, এসব অসৎ অযোগ্য লোকেরাই মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনদের সঙ্গে নিয়মিত দুর্ব্যবহার করেন এমনকি তাদের ভুল-ত্রুটি ধরার জন্য সব সময় উদগ্রীব হয়ে থাকেন।

কখনো কখনো তাদের মতের সঙ্গে মিল রেখে ওয়াজ-নসিহত করার জন্য ইমাম-খতিবকে বাধ্যও করে থাকেন। লক্ষ করলে দেখা যায়, মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধনের ব্যাপারে কমিটির লোকজন যতটা সজাগ থাকেন ইমাম-মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের বেতন-ভাতার বিষয়ে তারা ততটা অসচেতন থাকেন।

অর্থাভাবে ইমাম-মুয়াজ্জিনের মানবেতর জীবনযাপনের কারণে আলেমরা ইমাম-খতিব হওয়ার দিকে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। এর ফলে জাতি যোগ্য ইমাম-খতিব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মসজিদগুলোতেও ক্রমেই দেখা দিচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়।

মসজিদ কমিটির সদস্যদের জন্য মসজিদ পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা ফরজ, সেখানে কমিটির অনেক সদস্যের ইসলামের ন্যূনতম ফরজ জ্ঞানটুকুও নেই। মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরে পেতে চাইলে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহের আদলে মসজিদকে গড়ে তুলতে হবে।

মসজিদ কমিটি দ্বীনদার, সৎ, যোগ্য, আমানতদার, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করতে হবে। পাশাপাশি ইমাম-খতিবরা যেন স্বাধীনভাবে দ্বীনের কাজ পরিচালনা করতে পারেন সে সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ চার মসজিদ

সব মসজিদ আল্লাহর ঘর। কিন্তু মর্যাদা ও ফজিলতের দিক থেকে ইসলামে চারটি মসজিদকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো—মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদুল আকসা ও মসজিদে কোবা। বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এই চার মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব মসজিদের মর্যাদা সমান।

নিম্নে উল্লিখিত প্রতিটি মসজিদের পৃথক পৃথক ফজিলত তুলে ধরেছেন মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

মসজিদুল হারামের বিশেষ মর্যাদা

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হলো মক্কায় অবস্থিত মসজিদুল হারাম। কোরআন ও হাদিসে এ মসজিদের বহু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

মুসলমানদের কিবলা

মুসলমানদের কিবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানকে সালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের (কাবাগৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কাবার দিকে) ফিরিয়ে দাও।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৪৪)

এক লাখ গুণ বেশি সওয়াব : মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি সওয়াব হয়। আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করার ফজিলত অন্য মসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি।(সহিহুল জামি, হাদিস : ৪২১১)

কাবাগৃহ সামনে বা পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেন, যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করবে না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এটা কাবার উত্তর বা দক্ষিণের লোকদের জন্য। কেননা কাবা হচ্ছে মদিনার সরাসরি দক্ষিণে)। আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় গেলাম, সেখানে পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। তখন আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করতাম। (বুখারি, হাদিস : ৩৯৪)

মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

কাবাগৃহের বিশেষ মর্যাদা এ কারণেও যে এখানে কোনো বিধর্মী তথা কাফির-মুশরিক প্রবেশ করতে পারবে না।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনরা! মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব, তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের কাছে না আসে।’ (সুরা : তাওবা, আয়াত : ২৮)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আবু বকর (রা.) নবম হিজরিতে হজে আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে আমি যেন কোরবানির দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত

লোকদের) এ ঘোষণা করে দিই যে এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না। (বুখারি, হাদিস : **১১৯০**)

মসজিদে নববীর ফজিলত

মদিনায় অবস্থিত মসজিদে নববী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত। এই মসজিদের বিশেষ ফজিলত আছে। এই মসজিদও হারামের অন্তর্ভুক্ত। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী এই দুই মসজিদকে একত্রে ‘হারামাইন’ বলা হয়।

মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ে হাজার গুণ বেশি সওয়াব : আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মসজিদুল হারাম (কাবা) ছাড়া আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব। (বুখারি, হাদিস : **১১৯০**)

এই মসজিদের একটি স্থান হলো জান্নাতের বাগান : আবদুল্লাহ ইবনু জায়েদ মাজিনি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান। (বুখারি, হাদিস : **১১৯৫**)

অন্য বর্ণায় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার মিম্বার অবস্থিত আমার হাউজের (কাউছার) ওপর। (বুখারি, হাদিস : **১১৯৬**)

মসজিদুল আকসার ফজিলত

পৃথিবীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ হলো মসজিদুল আকসা। 'বায়তুল মুকাদ্দাস' বা 'বায়তুল মাকদিস' ফিলিস্তিনের কুদস অথবা জেরুজালেম বা (পুরাতন নাম) ঈলিয়া শহরে অবস্থিত। মক্কা থেকে কুদস (উট বা ঘোড়ায় চড়ে) ৪০ দিনের সফরের দূরত্ব। এই মসজিদেরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

মুসলমানদের প্রথম কিবলা : সালাত ফরজ হওয়ার পর থেকে প্রথম ১৬/১৭ মাস 'বায়তুল মুকাদ্দাস' ছিল মুসলমানদের প্রথম কিবলা।

ইসরার শেষ স্থান : রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মহান আল্লাহ তাআলা মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা পর্যন্ত ইসরা বা রাত্রির ভ্রমণ করিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায়, যার চতুষ্পার্শ্ব আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শন দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা ইসরা : ১)

মিরাজ শুরু হয়েছিল এই মসজিদ থেকে : মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (সা.)-কে এই মসজিদ থেকেই মিরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে পুনরায় এখানেই নামিয়ে ছিলেন।

মসজিদে কোবার ফজিলত

হিজরতের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় প্রবেশের আগে কোবা নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং একটি মসজিদ তৈরি করেন। তারপর সেখানে সালাত আদায় করেন। এটাই কোবা মসজিদ নামে পরিচিত। এটি মসজিদে নববী থেকে তিন মাইল বা পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ

রাসুলুল্লাহ (সা.) হিজরতের পর মদিনায় পৌঁছার আগে কোবা নামক স্থানে সওয়ারি থেকে অবতরণ করেন ও কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদের নাম হচ্ছে 'মসজিদে কোবা', যে মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে তা বেশি হকদার যে তুমি সেখানে সালাত আদায় করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।' (সুরা তা, আয়াত : ১০৮)

অমুসলিম দেশে মুসলিম স্থাপনা ও এর গুরুত্ব

মুসলমান দেশ ছাড়াও বিশ্বের অমুসলিম অনেক দেশেই ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে। আর সেসব দেশের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে এসব স্থাপনা।অমুসলিম দেশগুলোতে মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনেক।সেখানে বসবাসরত মুসলিমদের জন্য সেসব মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি অমুসলিমদের মধ্যেও মুসলিম সংস্কৃতি কে তুলে ধরে।দৈনিক ৫ ওয়াক্ত আজান ও মসজিদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক কার্যাবলি অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলতে ভূমিকা রাখে। বিশ্বের বিভিন্ন অমুসলিম দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক মসজিদ।নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মসজিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রইলো।

লা গ্র্যান্ড মসজিদ প্যারিস, ফ্রান্স

ইউরোপের অন্যতম দেশ ফ্রান্স। ফ্রান্সেও রয়েছে অসংখ্য মসজিদ। তবে এসব মসজিদের মধ্যে অন্যতম প্যারিসের গ্র্যান্ড মসজিদ।এটি ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় এবং ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ। ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মুসলিম তিরাইল্লাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কয়েক হাজার জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রায় ১ লাখের বেশি মুসলিম মৃত্যুবরণ করেন। এসব মুসলমানের স্মরণেই মসজিদটি নির্মিত হয়।

১৯২২ সালে ফ্রান্সের পার্লামেন্টে এই মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব পাস হয়। মসজিদ নির্মাণের জন্য নগরীর সবচেয়ে দামি এলাকায় সাড়ে ৭ হাজার বর্গমিটার জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়। মসজিদ নির্মাণে ৫ লাখ ফ্রাঙ্ক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ফরাসি

উপনিবেশভুক্ত দেশ আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া ও মরক্কোর মতো দেশগুলোর মুসলমানরাও মসজিদ নির্মাণে আর্থিক অনুদান দেন। ১৯২৬ সালে মসজিদটি নির্মাণ সম্পন্ন হয়.মসজিদটির সুউচ্চ মিনারের উচ্চতা প্রায় ৩৩ মিটার। এটি প্যারিসের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন মসজিদ। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্যাস্টন ডমার্গ বিখ্যাত মসজিদটির উদ্বোধন করেন। ওই দিনই প্রথম এই মসজিদে নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। আলজেরিয়ান সুফি আহমেদ আল আলা প্রথম মসজিদের তত্ত্বাবধান করেন। এখন মসজিদটির দায়িত্বে আছেন মুফতি দালিল বৌবাকার।

ইসলামিক সেন্টার অব আমেরিকা

মিশিগান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি আমেরিকায় খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশি। তবে এরপর রয়েছে পবিত্র ইসলাম ধর্ম, যা দেশটির তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম। অমুসলিম দেশটির বিখ্যাত মসজিদের নাম ‘ইসলামিক সেন্টার অব আমেরিকা’। মসজিদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঞ্চলের ডারবান শহরে অবস্থিত। ২০০5 সালে নির্মিত মসজিদটি উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদটি মূলত শিয়া মুসলমানদের জন্য তৈরি করা হলেও সব মুসলিম এখানে প্রার্থনা করতে পারে। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক সেন্টার আমেরিকা। যার মূল নায়ক ছিলেন ইমাম মোহাম্মদ জাওয়াদ চিরি। সংস্থাটি তখন আমেরিকার মুসলিম অধ্যুষিত ডারবানে একটি মসজিদের প্রয়োজন

অনুভব করে। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে ইমাম মোহাম্মদ জাওয়াদ চিরি আমেরিকায় সংখ্যালঘু দলের কাছে মসজিদের প্রস্তাব রাখেন। তার হাত ধরেই দৃষ্টিনন্দন মসজিদটি নির্মিত হয়। ধীরে ধীরে এই মসজিদে মুসলিম সমাগম বাড়তে থাকে। চমৎকার স্থাপত্যকলায় সমৃদ্ধ এই সুরম্য মসজিদটি দেশটির দৃষ্টিনন্দন একটি মসজিদ।

জামে মসজিদ

দিল্লি, ভারত:ভারতের সবচেয়ে অসাধারণ স্থাপত্যের মধ্যে অন্যতম দিল্লির জামে মসজিদ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে এর গুরুত্ব ব্যাপক। পুরান দিল্লির অলিগলিতে হাঁটলেই এটি চোখে পড়বে। মসজিদ-ই-জাহান-নুমা নামকরণ হলেও ভারতীয়দের কাছে এটি দিল্লির জামে মসজিদ হিসেবেই পরিচিত। এটি ভারতের বৃহত্তম মসজিদ। ১৬৪৪ থেকে ১৬৫৬ সাল পর্যন্ত সময় ব্যয় করে মুঘল সম্রাট শাহজাহান এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন ব্যয় হয় ১ মিলিয়ন রুপি। মসজিদটি প্রবর্তিত হয় উজবেকিস্তানের ইমামের মাধ্যমে। মসজিদের ডিজাইনে রয়েছে তিনটি বড় দরজা, চারটি মিনার, দুটি ৪০ মিটার উঁচু মিনার। এটি নির্মাণ করা হয় সম্পূর্ণ লাল বালু পাথর ও সাদা মার্বেল দিয়ে। মসজিদের পূর্বদিকের গেটটি ব্যবহার করা হতো সম্রাটের ঢোকার জন্য। মসজিদের ৪০৮ স্কয়ার ফুটের হলরুমে একসঙ্গে ২৫ হাজার মানুষ নামাজ আদায় করতে পারে। মসজিদে রয়েছে তিনটি গম্বুজ। এর মেঝেতে ৮৯৯টি কালো দাগ দিয়ে প্রার্থনাকারীদের অবস্থানের লাইন নির্দেশ করা হয়েছে। মসজিদটি সাদা ও কালো মার্বেল পাথর দিয়ে এমনভাবে সাজানো হঠাৎ দেখেই মনে হবে সব জায়গায় নামাজের

পাটি বিছানো। জামে মসজিদের স্থাপত্য পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ বাদশাহী মসজিদের আদলে। পাকিস্তানের লাহোরে শাহজাহানের ছেলে আওরঙ্গজেবের প্রতিষ্ঠিত মসজিদের আদলেই দিল্লির জামে মসজিদটি তৈরি করা হয়। ২০০৬ ও ২০১০ সালে মসজিদটি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়।

কর্ডোভা মসজিদ

আল আন্দালুস, স্পেন:ইউরোপের রাষ্ট্র স্পেন। এটি মূলত খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বী প্রধান দেশ। এখানে মুসলিমদের 'মুর' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যার স্প্যানিশ উচ্চারণ 'মোরো'। অনিন্দ্য সুন্দর স্পেনের আল আন্দালুসিয়া অঞ্চলে আছে মুসলিমদের প্রাচীন মুসলিম স্থাপনা কর্ডোভা মসজিদ। জানা গেছে, খলিফা প্রথম আবদুর রাহমানের শাসনামলে ৭৮৪ থেকে ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে আন্দালুসিয়ার কর্ডোভায় নির্মিত হয় ঐতিহাসিক কর্ডোভা মসজিদ। পরে অন্যান্য শাসক এই মসজিদের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধন ঘটে। তবে কথিত আছে, মসজিদের জায়গাটি আগে ক্যাথেড্রাল গির্জা ছিল; যা সেন্ট ভিনসেন্ট-৩ উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে গির্জাটি দুই ভাগ করে খ্রিস্টানদের গির্জা ও মুসলিমদের মসজিদের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। এরপর খ্রিস্টানদের কাছ থেকে বাকি অংশটি কিনে নেন আবদুর রাহমান। তারপর এর পুরোটা ভেঙে কর্ডোভার মসজিদের জন্য নতুন করে ভিত্তি স্থাপন করা হয়। মসজিদটি নির্মাণ পরিকল্পনায় যুক্ত করা হয় ঐতিহ্যবাহী রোমান স্থাপত্যশৈলী। মসজিদটি সাজাতে ব্যবহার করা হয়েছে সোনা, তামা, কপারসহ দামি দামি বেশ কিছু ধাতব উপাদান। পুরো মসজিদে বিস্ময়কর মোজাইক

ও আজুলিজস দিয়ে সাজানো হয়েছে। কর্ডোভা মসজিদ দেশটির রাজধানী শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এটিই শহরকে আলাদা সৌন্দর্যে ফোকাস করে। আল আন্দালুসের বাসিন্দাদের কাছে মসজিদের সৌন্দর্য এত বেশি উজ্জ্বল যে, তা যে কোনো সুন্দর বৈশিষ্ট্যকে হার মানাতে সক্ষম।

লাল মসজিদ

কলম্বো, শ্রীলঙ্কা

প্রাচীনকাল থেকেই শ্রীলঙ্কা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীতে শ্রীলঙ্কা একমাত্র অমুসলিম দেশ, যেখানে রেডিও-টেলিভিশনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান দেওয়া হয়। সেই দেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মসজিদগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হলো- লাল মসজিদ। রাজধানী কলম্বোর এই মসজিদের আসল নাম জামিউল আলফার। শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যবাহী লাল রং দিয়ে মসজিদের দেয়াল অলঙ্করণের জন্য পরবর্তীতে নামকরণ করা হয়েছে- লাল মসজিদ। মসজিদ নির্মাণের সময়কাল ১৯০৮-০৯ সাল। সেখানকার বোরাহ মুসলিম কমিউনিটি লাল মসজিদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার নামাজ আদায়ের উদ্দেশে লাল মসজিদ নির্মাণ করেন তাঁরা। মসজিদটির নকশা করেন দক্ষিণ ভারতীয় এক স্থপতি। নকশার সময় ডালিমকে মূল নকশায় রাখা হয়।

কোবে মসজিদ

কোবে, জাপান:কারিগরি শিল্পে উন্নত প্রযুক্তির দেশ জাপান। বৌদ্ধ ধর্মের সংখ্যাধিক্যের দেশ হলেও সেখানে রয়েছে প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান। জাপানে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদ ‘কোবে মসজিদ’। ‘মুসলিম সেন্টার’ নামেও এ মসজিদের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। চেক স্থপতি জান জোসেফ সগ্রার কোবে মসজিদের নকশা করেন। ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য রীতিতে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ নকশায় জ্যামিতিক ও ইসলামিক প্যাটার্ন ব্যবহার করেন। তিন তলাবিশিষ্ট এ মসজিদে রয়েছে বৃহৎ গম্বুজ ও মিনার। তুর্কি রীতিতে মেহরাবকে সাজানো হয় সোনালি রং ও শ্বেত পাথরে। নারীদের জন্য আছে পৃথক নামাজের স্থান। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মসজিদটি তিনটি ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবিলা করেছে। ১৯৩৮ সালের বন্যা, ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমাবর্ষণ, ১৯৯৫ সালের ‘গ্রেট হানসিন’ ভূমিকম্প।

সেন্ট্রাল মসজিদ

লন্ডন, যুক্তরাজ্য

‘সেন্ট্রাল মস্ক’ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থিত। এই স্থাপনাটি যুক্তরাজ্যের ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা রিজেন্টস পার্ক মসজিদ নামে পরিচিত। বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, মসজিদটি লন্ডনের রিজেন্টস পার্কের পাশে অবস্থিত। মসজিদটির নকশা করেছেন স্থপতি ফ্রেদেরিক জিববার্ড এবং এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৭৮ সালে। মসজিদটির

প্রধান আকর্ষণ হিসেবে দৃশ্যমান আছে এর বিশালাকার সোনালি রঙের গম্বুজ। এর প্রধান হলরুমে একসঙ্গে ৫ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন। এখানে নারীদের জন্যও নামাজের সুব্যবস্থা রয়েছে। বৃহদাকার কার্পেটে মোড়ানো মসজিদের মেঝে। আছে যৎসামান্যই ফার্নিচার। গম্বুজের ভিতরের দিকটি সাজানো হয়েছে ইসলামী ঐতিহ্যের কিছু ভাঙা আকৃতির উদাহরণ দিয়ে। মসজিদ কম্পাউন্ডে ছোট একটি বইয়ের দোকান ও একটি হালাল ক্যাফে আছে। মসজিদে নানা রকম ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন হয়। এই সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৪ সালে কিং জর্জ-৬ এর হাত ধরে। ব্রিটেনে মুসলিম কমিউনিটির জন্য মসজিদের জমি দান করেন তিনি।

কলোগনি সেন্ট্রাল মসজিদ

কলোগনি,জার্মানি:জার্মানির বৃহত্তম মসজিদ কলোগনি মসজিদ। একে নিয়েও হয়েছিল নানা তর্কবিতর্ক। তবে পরবর্তীতে জার্মান মুসলমানদের দ্বারা বৃহৎ মসজিদের স্বীকৃতি পায় কলোগনি মসজিদ। এর নকশা করা হয় অটোমান স্থাপনার আদলে। এই মসজিদের দেয়াল তৈরি করা হয়েছে কাচ দিয়ে। দুটি মিনার ও এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। ওপর থেকে এর মনোরম দৃশ্য যে কারও নজর কাড়বে। এ মসজিদে রয়েছে একটি বাজার। সেখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও যায় সাশ্রয়ী মূল্যে কেনাকাটা করতে। ইউরোপের মধ্যে এই মসজিদটি সবচেয়ে বড়। এর মিনারের উচ্চতা বেশি। মসজিদের আয়তন ৪৮ হাজার বর্গমিটার। এখানে প্রায় ৪ হাজার মানুষ একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারে। মসজিদের একটি কংক্রিট ও গ্লাসের গম্বুজ রয়েছে। এ

ছাড়াও দুটি ৫৫ মিটারের মিনার আছে। মসজিদে ঢোকার পথে পড়বে বাজার। বয়ানের কক্ষটি নিচতলায়। তবে নামাজ পড়ার জন্য ব্যবস্থা আছে ওপরের তলাগুলোতে। বহু ইসলামী বই মিলবে এখানকার লাইব্রেরিতে

কুল শরিফ মসজিদ:কাজান ক্রেমলিন, রাশিয়া-তাতারি মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বিখ্যাত কুল শরিফ জামে মসজিদ। যা রাশিয়ান স্থাপত্যশিল্পের এক চমৎকার উপহার। রুশ ফেডারেশনভুক্ত মুসলিম প্রজাতন্ত্র তাতারিস্তানের কাজান শহরে অবস্থিত দৃষ্টিনন্দন মসজিদটি। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। তবে নির্মাণের কিছুদিন পর রাশিয়ার জল্লাদখ্যাত ইভান দ্য টেরিয়্যাফ মসজিদটি ভেঙে ফেলে। এভাবে চলে যায় কয়েক শ বছর। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সৌদি সরকার ও তাতারি মুসলমানদের জোর দাবিতে মসজিদ পুনর্নির্মাণের আনুমতি দেয় রুশ সরকার। মসজিদের পুরনো ডিজাইন অক্ষুণ্ন রেখে নতুন ডিজাইন প্ল্যানে ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর পুনর্নির্মাণের কাজ চলে। এটি রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদটির আয়তন ১৯ হাজার বর্গমিটার।

মানবিক ও সুস্থ ধারার সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা :

মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুর নাম মসজিদ। মসজিদ ছাড়া মুসলিম সমাজ কল্পনা করা যায় না। মসজিদ শিআরে ইসলাম তথা ইসলামের নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত। কোনো অঞ্চলে মসজিদ থাকার অর্থ হলো সেখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব আছে। মসজিদকে

আদর্শ ইসলামী সমাজের হৃৎপিণ্ডও বলা যায়। আল্লাহ তায়ালার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ। মদিনায় হিজরতের পর রসুলুল্লাহ সা. এর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো মসজিদ থেকে। রসুলুল্লাহর সা. পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন পরবর্তী খলীফাগণ। ইসলামের প্রথম যুগের মসজিদের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, দেখতে পাব, সেই সময়ের মসজিদ শুধু নামাযের ঘর ছিল না; বরং তাদের মসজিদ ছিল পরামর্শগৃহ, বিচারালয়, শিক্ষাকেন্দ্র, মজলুমের আশ্রয়স্থল, শিশুদের আনন্দধাম। রাসূলের সা. মসজিদ ছিল সৌরজগতের সূর্যের মতো; সূর্যকে কেন্দ্র যেমন আবর্তিত হয় সকল গ্রহ-উপগ্রহ; তেমনি মুসলমানদের আধ্যাত্মিক, মানবিক ও সামাজিক সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতো মসজিদকে ঘিরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, কালের পরিক্রমায়, বিশেষত বাংলাদেশে, মসজিদ হয়ে গেছে শুধুই নামাযের স্থান। মুসলমানদের চরিত্র গঠন, দীনি শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কর্মসূচীতে মসজিদের কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে।

মানবিক ও সুস্থ ধারার সমাজ গঠনে মসজিদের ভুমিকা

ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব: মসজিদ পৃথিবীর আদি নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে সবার আগে মসজিদ সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায় অবস্থিত। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য [আলে ইমরান ৯৬]। রসুলুল্লাহ সা. যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, মদিনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করলেন। মসজিদে কুবা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদ হাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এরপর তিনি যখন মদিনা নগরীতে প্রবেশ করলেন, সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মদিনার কেন্দ্রবিন্দুতে নির্মাণ করলেন মসজিদ। তখন মুহাজির সাহাবিদের কোনো

ধনসম্পদ ছিল না। সকল সহায়-সম্পত্তি মক্কায় রেখে তারা এক কাপড়ে ঘর ছেড়েছিলেন। এই রকম সংকটময় মুহূর্তেও রাসূল সা. মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করে এর অবকাঠানো তৈরি করলেন। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে রাসূল সা. শুধু আদেশ করেই ক্ষান্ত হননি, হাদীস ও ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবিদের সাথে তিনি নিজ হাতে কাদামাটির ইট বানিয়েছেন, সেই ইট কাঁধে বহন করেছেন। রাসূলের কাছে মসজিদের নির্মাণ কাজও এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।তিনি যে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, বারবার তার নজির স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, যারা মসজিদ নির্মাণ করে, তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর বানাবেন। [বুখারী ও মুসলিম]অন্যত্র রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে। সাত শ্রেণির এক শ্রেণি হলো ওই সকল মানুষ, যাদের হৃদয় সব সময় মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। [বুখারী ও মুসলিম]

আদর্শ সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা: আদর্শ ও মানবিক সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু, তার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা আমরা রাসূলের সা. যুগের মসজিদে নববি থেকে পাই। সকল প্রকার ধর্মীয়, মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে এই মসজিদ থেকে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যস্থার মাধ্যমে অগ্নিগহ্বরের কিনারায় অবস্থিত একটি জাতিকে রাসূল সা. সোনার মানুষে পরিণত করেছেন।

একত্ববাদের চেতনা তৈরি: মসজিদ তাওহিদের প্রতীক। মসজিদে রাসূলের তরিকায় এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদের ইমাম-খতিব যদি বিজ্ঞ ও হকপন্থী আলেম হন এবং ওই সমাজ যদি মসজিদ দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে মুসল্লিদের ভেতর থেকে আপনাআপনি শিরিক বা বহুত্ববাদী চেতনা দূর হয়ে যায়। রসুলুল্লাহ সা. জুমআর বয়ানে,

সাধারণ আলোচনায়, ব্যক্তিগত নসিহতে বারবার শিরিকের ব্যাপারে মুসল্লিদেরকে সতর্ক করতেন। যার ফলে এক সময়ের মূর্তিপূজারী মানুষগুলো শিরিক বর্জন করে তাওহিদের রশিকে শক্ত করে আকড়ে ধরে। কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী একজন ইমাম যখন মসজিদে নববির আদলে তার মুসল্লিদেরকে তাওহিদের দীক্ষা দেন এবং শিরিকমুক্ত ঈমান গঠনের নাসিহাহ পেশ করেন, তখন সেই সমাজ খুব সহজেই তাওহিদি সমাজে পরিণত হয়।

ভ্রাতৃত্ববোধ: ইসলাম যে কয়টি বিধানের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। [বুখারী ও মুসলিম] মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সুসম্পর্ক তৈরিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মানুষেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করে। নামাযের কাতারে ইসলাম ধনী-গরিব, আমীর-ফকিরের কোনো বৈষম্য রাখেনি। ফলে প্রতিটি মানুষ তার পেশা, বংশ ও অর্থনৈতিক তারতম্য পেছনে ফেলে নামাযের কাতারে এক ও অভিন্ন মর্যাদার মানুষে পরিণত হয়। এতে সুদৃঢ় হয় পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্মূল হয় উঁচুনিচুর ভেদাভেদ। তাছাড়া নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রত্যেকে তার মুসলমান ভাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে। অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো বিপদে কেউ নামাযে অনুপস্থিত থাকলে বাকিরা সহজেই তার খোঁজখবর এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারে। আবার সালাতের মাধ্যমে প্রতিদিন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এভাবে মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসায় একটি জাতিকে একই সুতোয় গাথা একটি তসবিহতে পরিণত করে।

নেতৃত্ব ও আনুগত্যের অনুশীলন: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যিনি নামাযের ইমাম তিনি সমাজেরও ইমাম। একজন ইমাম যখন মসজিদ পারিচালনা করেন, সালাতের নেতৃত্ব দেন, মুসল্লিদের নাসিহাহ করেন, তার মধ্যে সামাজিক নেতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ত যোগ্যতা তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সমাজের জন্য তিনি প্রোডাক্টিভ নেতায় পনিণত হন। আবার মুসল্লিবৃন্দ, যারা নামাযে ইমামের হুবহু অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে নেতাকে মান্য করারে মানসিকতা এবং আনুগত্যের বোধ জাগ্রত হয়। ফলে সেই সমাজের মানুষেরা, মসজিদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা অনুশীলনের কারণে, সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হয়।

জ্ঞানচর্চার সূতিকাগার: রাসূলের যুগের মসজিদে নববি ছিল কুরআন ও হাদীস চর্চার দরসগাহ। আসহাবে সুফফার কথা আমরা জানি। একদল দরিদ্র সাহাবি, ইলমচর্চার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের কোনো পেশা ছিল না। মসজিদে নববিতে পড়ে থাকতেন। কোনো খাবার হাদিয়া এলে খেতেন না এলে উপোস থাকতেন। তারা রাসূলের সা. মুখনিঃসৃত হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন। এছাড়া রাসূল সা. যখনই সুযোগ পেতেন, মসজিদে এসে সাহাবিদেরকে কুরআন ও হাদীস শেখাতেন।

মসজিদ যেন ইলমচর্চার মারকায হয়ে ওঠে, এ ব্যাপারে রাসূল সা. সাহাবিদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি মসজিদে ইলমচর্চার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত ও পরস্পরে জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন; মহান আল্লাহ উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে জ্ঞানচর্চাকারীদের কথা আলোচনা করেন। [মুসলিম]

মসজিদভিত্তিক মক্তব আমাদের সোনালি অতীত। মক্তব বাদ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। অথচ অত্যন্ত সুকৌশলে এই অপূর্ব কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। মসজিদভিত্তিক দীনি জ্ঞানচর্চার

ধারা জারি থাকলে মানুষেরা খুব সহজেই ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে। আর কোনো সমাজে ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানবান মানুষেরা সংখ্যা যত বাড়ে, সেই সমাজ ততবেশি অপরাধ, দুর্নীতি, হত্যা, অশ্লীলতা, ধর্ষণ, যৌতুক ও মাদকমুক্ত সোনার সমাজে পরিণত হয়। অতীতের মক্তবভিত্তিক কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থা তার পরীক্ষিত উদাহরণ। এছাড়া মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের সংস্কৃতি চালু থাকলে মুসল্লিরা নামাযের পাশাপাশি কুরআন হাদীসসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমৃদ্ধ হতে পারে। যে সমাজে মসজিদভিত্তিক জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি যত জোরালো হবে, সেই সমাজ ততবেশি মানবিক, সুস্থ ও আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত হবে।

পারিবারিক সংকট নিরসন: রাসূল সা. সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন পরিবার-ব্যবস্থাকে। পারিবার রিলেটেড যত হাদীস আছে, অন্য কোনো বিষয়ে সম্ভবত এত হাদীস বর্ণিত হয়নি। কারণ—পরিবার হলো সভ্যতার সূতিকাগার। পরিবার ধ্বংস হলে সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাসূল সা. মসজিদে বসে সাহাবিদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান দিতেন। কখনো স্বামী-স্ত্রীকে উপস্থিত করে কাউন্সেলিং করতেন। একটি আদর্শ মসজিদের বৈশিষ্ট্য এটাও যে, সেখানে পারিবারিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের উচিত—মসজিদে এমন ব্যবস্থা রাখা, যেন সমস্যাগ্রস্ত মানুষেরা সহজেই তাদের সমাধান পেয়ে যায়।

পরামর্শগৃহ: নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ পরামর্শ সভার জন্য ব্যবহৃত হতো। হদ, জিহাদ, চুক্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতি সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো মসজিদে নববিতে, পরামর্শের ভিত্তিতে। সেই অর্থে মসজিদে নববি ছিল পরামর্শগৃহও। রাসূলের সা. পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত মসজিদে নববিতে নেয়া হতো। একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে মসজিদভিত্তিক পরমর্শসভার বিকল্প নেই। পরামর্শের জন্য মসজিদের বরকত

তো আছেই, পাশপাশি দায়িত্বশীলরা যখন পরামর্শ করতে মসজিদে একত্রিত হন, তখন কাজটার প্রতি তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়।

মসজিদকেন্দ্রীক আইন ও বিচারব্যবস্থা: নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ সালিশ-বিচারের জন্যও ব্যবহৃত হতো। নববি যুগ, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ সহ ইসলামের সোনালি দিনের মুসলিম সমাজের বিচার ব্যবস্থা ছিল মসজিদকেন্দ্রীক। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে রাসূল সা. সমাজ থেকে সকল প্রকার অপরাধের মূলোৎপাটন করেছিলেন। এখনো কোনো সমাজে যদি মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার সংস্কৃতি চালু থাকে, তবে সেই সমাজ নববি আমলের সুফল পেতে পারে। মিথ্যা মামলা, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষ খেয়ে বিচারক কর্তৃক নিরপরাধকে ফাঁসিয়ে দেয়ার মতো জঘন্য পাপ ও অন্যায় চালু আছে দুনিয়া জুড়ে। যার কারণে মানুষ ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থা চালু থাকলে এই অপকর্ম রোধ করা সম্ভব। কারণ, মসজিদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভীতি নেই, এমন মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। মসজিদে দাঁড়িয়ে ভুল বিচার বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে গেলে যে কেউই দশবার ভাববে। অতএব মসজিদকেন্দ্রীক বিচারব্যবস্থা চালু হলে আখেরে জনগণেরই কল্যাণ হবে এবং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে ইনসাফ।

মসজিদের অর্থনৈতিক ভূমিকা: সমাজ পরিবর্তনের জন্য মসজিদগুলোকে ধর্মীয় দায়িত্বের পাশাপাশি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে হবে। মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনার ভাগিদার হতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে। রাসূল সা. যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালামাল বণ্টন করতেন মসজিদ প্রাঙ্গনে। আবার যাকাতের মাল গ্রহণ ও বিতরণ করতেন মসজিদে নববির ভেতর। মসজিদে শিক্ষাদান অথবা নাসিহাহ করার সময় কখনো রাসূলের সা. কাছে খাদ্যদ্রব্য হাদিয়া এলে রাসূল সা. মসজিদে বসে সেই খাদ্যদ্রব্য সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। মসজিদে কোনো ক্ষুধার্ত আগন্তুক এলে

রাসূল সা. তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন অথবা কোনো সাহাবির বাড়িতে পাঠাতেন। জনগণের প্রতি যে মসজিদের এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও আছে, তার প্রমাণ আমরা এসব ঘটনা থেকে পাই।তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের কাছে ক্ষুধা এক রূঢ় সত্যের নাম। তীব্র ক্ষুধা ও অভাবের কারণে অনেক মানুষ ঈমান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত অসংখ্য মানুষ সালাত আদায় না করার পেছনে অভাবকে দায়ী করে। আবার অভাবের কারণে এদেশের পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনার নাম। রাসূল সা. জানতেন যে দরিদ্রতা কখনো কখনো ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে। এ জন্য তিনি দুআ করতেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কুফুরি ও ফকিরি থেকে পানাহ চাই।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে মসজিদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করা খুবই জরুরি। মসজিদ কর্তৃপক্ষ চাইলে যাকাত-ফিতরা আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করতে পারে। আবার ফান্ড তৈরি করে অভাবীদের কাছে খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসেবা পৌঁছতে পারে।স্বাবলম্বীকরণ, অভাব দূরীকরণ, বিনামূল্যে খাদ্যবণ্টন, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মসজিদকে সম্পৃক্ত হতে হবে, যেভাবে সম্পৃক্ত ছিল রাসূলের সা. মসজিদ। তবেই মসজিদভিত্তিক সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

সমাজ-সম্পৃক্ত মসজিদ নির্মানে বাংলাদেশের আস- সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা -প্রতিষ্ঠাতার জবান থেকে : আল্লাহর শোকর, প্রতিষ্ঠার শুরুলগ্ন থেকেই আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন দীনি ও জনসম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় মসজিদে নববির আদলে দীনি চেতনা সমৃদ্ধ, সমাজ-সম্পৃক্ত, কল্যাণমুখী একটি মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের দিকে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী। আমরা মসজিদভিত্তিক আদর্শ

সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষী। সালাত আদায়ের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদে যেসব কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হতো, আমরা আমাদের মসজিদ কমপ্লেক্সে সেসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে চাই।

মসজিদ-ভিত্তিক দীনি শিক্ষা-ব্যবস্থা: আস-সুন্নাহ মসজিদ কমপ্লেক্সে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জন্য পৃথক সালাত আদায় ও দীনি শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা আছে। এখাসে থাকবে শিশুদের জন্য প্লে গ্রাউন্ড, যেন তারা মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মসজিদের একপাশে অমুসলিমদের কর্নার থাকবে; যেন তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে খুতবা শ্রবণসহ ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে।

দীনি ও জেনারেল শিক্ষার সমন্বয়ে আধুনিক মাদরাসা: এই মাদরাসায় নারী ও পুরুষের জন্য পৃথকভাবে দীনি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বিত সিলেবাসের পাঠপ্রদান করা হবে। সাধারণ সিলেবাসের সাথে দশম শ্রেণির মধ্যে ধাপে ধাপে হিফয সম্পন্ন করানো হবে। যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য আলেম গড়ে তোলা এই মাদরাসার লক্ষ্য।

শরয়ী সমাধান: এই বিভাগে সরাসরি বিজ্ঞ আলেম ও প্রশিক্ষিত মুফতীগণের সঙ্গে সাক্ষাত করে দীনি সমস্যার সমাধান জানা যাবে।

উচ্চতর ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র: জ্যেষ্ঠ ইসলামিক স্কলারদের তত্ত্বাবধানে নবীন মেধাবী আলেমদেরকে দুই-তিন বছরের কোর্সের মাধ্যমে যুগচ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যোগ্য করে গড়ে তোলা এই কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য। তাদেরকে সমাজ-বিজ্ঞানসহ দাওয়াহর ময়দানে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের ধারণা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া এই কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দীনি বিষয়ে গবেষণা করা হবে।

বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবাকেন্দ্র: গরিব-অসহায় রোগীদেরকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা-সহায়তা প্রদান করা হবে। ক্ষেত্রবিশেষ ওষুধ ও উন্নত চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ফ্যামিলি কাউন্সেলিং বিভাগ: দাম্পত্য-কলহ নিরসনকল্পে ও পারিবারিক ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই বিভাগ কাজ করবে। সমাজতত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞ আলেমদের মাধ্যমে বিবাহেচ্ছু ও বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

সমাজকল্যাণ পরিচালনা বিভাগ: এই বিভাগ থেকে মানব-কল্যাণে নানা সেবামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। স্বাবলম্বীকরণমূলক নানা কার্যক্রম, অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, এতিম ও বিধবাদের দায়িত্বগ্রহণ এবং সেবামূলক নানা কার্যক্রম এই বিভাগ থেকে পরিচালিত হবে ইন-শা-আল্লাহ।

পাবলিক লাইব্রেরি: সর্বসাধারণকে দীনি ও উপকারী বই-পুস্তক পড়তে উৎসাহিত করার জন্যে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বৃহৎ পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হবে ইন-শা-আল্লাহ।

শিশু-কিশোরদের জন্য ইসলামী সংস্কৃতিকেন্দ্র: শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সুস্থ বিনোদনচর্চা অপরিহার্য। অথচ আজকাল শিশুরা অনেকটাই অবহেলিত। শিশু-কিশোরদের সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। এখান থেকে সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধানাবলি শিক্ষাদান করা হবে।

মসজিদ মুসলিম সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাসূল সা. ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক। সেই অর্থে মসজিদ আমাদের জন্য রাসূলের সা. রেখে যাওয়া আমানত। এই আমানতের সুরক্ষা এবং এর সঠিক ব্যবহার আমাদের ওপর ফরজ দায়িত্ব। মসজিদভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাসূল সা. একটা পৃথিবীর পট পরিবর্তন করেছিলেন। পতোন্মুখ এই মুসলিম জাতিকে রক্ষা করতে মসজিদভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই।